প্রযুক্তি বুকলেট

মুরগি পালন

সহযোগিতায়

মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর
জেলার নদীবিধৌত চরাঞ্চলের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।

মুরগি পালন

ভূমিকা

ডিম পাড়ার জন্য যে মুরগি পালন করা হয় তাকে লেয়ার মুরগি বলা হয়। লেয়ার মুরগি সাধারণত মুরগি ১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শুরু করে এবং ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। তবে উন্নত হাইব্রিড জাতের মুরগী ৭২-৭৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। এর পর খামারে ঐ মুরগি পালন লাভজনক হয় না। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে লক্ষাধিক মাঝারি ও বড় আকারের লেয়ার খামার গড়ে উঠেছে, এ ছাড়াও আছে অগণিত ছোট ছোট সোনালি মুরগির খামার।

মুরগির উন্নত জাত নির্বাচন

দেশী জাতের মুরগিঃ

- বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় যে সমস্ত মুরগি চড়ে বেড়ায় তারাই দেশী জাতের মুরগি, এরা বাড়ির আঙ্গিনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কুড়িয়ে খায় বিধায় এদের সামান্য খাদ্য খরচ হয়।

- এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বেশী নয়, অন্যদিকে অপুষ্টিজনিত কারণে এদের ডিম উৎপাদনও আশানুরূপ হয় না এবং ডিমের ওজন বেশ হাল্কা।

- তবে এরা ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চা পালন করতে খুবই পারদর্শী

- এরা আকারে ছোটে হলেও খুব চঞ্চল ও চালাক প্রকৃতির ফলে এদেরকে সহজে বন্য প্রাণী ধরতে পারে না।

- সঠিক যত্ন না হওয়ায় দেশী বাচ্চা মুরগির মৃত্যুহার অধিক হয়, তবে বাচ্চা বয়সে দেশী মোরেগ-মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে সামান্য সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে আশানুরূপ ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব, এজন্য দেশী মুরগির যে সকল যত্ন নেয়া প্রয়োজন

- কৃমিনাশক চিকিৎসা করতে হবে

- নিয়মিত রাণীক্ষেত ও বসন্তের টিকা দিতে হবে।

- বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আন্তে হবে।

- সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

ফাওমি ঃ

• ফাওমি মুরগি মূলত মিশরের জাত।

• এরা দেশী জাতের মুরগির মত খুব চঞ্চল ও চালাক

• দেশী মুরগির মত এদের ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়।

সোনালী মুরগি ঃ

সোনালী মুরগি

• সোনালী একটি সংকর জাতের মুরগি

• আর,আই,আর মোরগ ও ফাওমি মুরগির সংকরায়ণে এ মুরগির সৃষ্টি

• প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগের ওজন ২.৫-৩.০ কেজি এবং মুরগি ২.০-২.৫ কেজি হয়, তবে ১ কেজি ওজনের সোনালী জাতের মুরগির চাহিদা বেশী

• সাধারণত এদেরকে ডিম পাড়া মুরগি হিসাবে পালন করা হয় না, এদেরকে বেশীরভাগই ব্রয়লার জাতের মুরগির মত খাবারের জন্য পালন করা হয়।

বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি ঃ

বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি মূলত ডিম পাড়ার জন্য পালন করা হয়। দেশে

বর্তমানে বিভিন্ন জাতের বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি স্বাভাবিক অবস্থায় ডিম উৎপাদনের পরিমান হচ্ছে -

• ২০ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ৫ ভাগ ডিম পাড়তে শুরু করে
• ২১ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ১০ ভাগ ডিম উৎপাদন হয়
• ২৬ হতে ৩২ সপ্তাহ বয়সে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হয়
• সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন শুরুর পর কিছুদিন স্থিতিশীল থাকে ও ডিমের আকার তেমন বড় হয় না; উৎপাদন হার কমার সময় ডিমের আকার বড় হতে থাকে
• ৫০ সপ্তাহ বয়সের পর ডিমের আকার স্থিতিশীল হয় এবং ৪০ সপ্তাহ বয়সের পর ওজন বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়।

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ

• মুরগির ঘর বাসস্থান থেকে একটু দূরে কোলাহল মুক্ত পরিবেশে হতে হবে।
• স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মুরগির সেড অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু জায়গায় করতে হবে
• ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
• মুরগির ঘর ভালভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত করতে হবে।
• ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ও দোচালা হবে, দুপুরের পরে যাতে সূর্যের তাপে সেড বেশী গরম না হতে পারে সেজন্য ঘরের পশ্চিম প্রান্তে সার্ভিস কক্ষ থাকবে
• সেডের উচ্চতা ৭-১০ফুট, চওড়ায় ২০-২৫ফুট ও লম্বায় অনুর্ধ ১০০ফুট হবে
• বাণিজ্যিক জাতের ডিম পাড়া মুরগিকে লালন-পালনের জন্য স্টার্টার, বাড়ন্ত ও লেয়ার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক সেড করতে হবে
• খামার পরিচালনায় পরিবারের দুই জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে যাতে এক জনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

লিটার পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

- মুরগির ঘর শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে
- লিটার ব্যবহার করলে মেঝেতে পায়খানা লেপ্টে যায় না।
- মুরগির জন্য আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর বিছানা তৈরী হয়।
- লিটারে মুরগি পালন সহজ হয় ও খাদ্য রূপান্তর হার বেশী হয়।

লিটার পদ্ধতি

মাঁচা পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

- মাঁচার উপর স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় থাকে
- রোগে বিস্তারের সম্ভাবনা কম ও জায়গা কম লাগে
- মাঁচার উপর মুরগির স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

মাচা পদ্ধতি

ডিমপাড়া বাক্স ঃ

- ডিমপাড়া বাক্সে প্রতিটি খোপে পাশে ১২ ইঞ্চি ও উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি থাকবে।
- ডিম পাড়ার জন্য ৪-৫ টি মুরগির জন্য একটি খোপ ব্যবহার করা যাবে।
- বাক্সে যথেষ্ট ভেন্টিলেশন ও কিছুটা অন্ধকার থাকবে।
- বাক্সে সম্মুখে মুরগি উঠার জন্য প্লাটফরম করতে হবে
- ডিমের বাক্সের ভিতর লিটার ব্যবহার করতে হবে।

এক দিনের বাচ্চা ক্রয় ঃ

- বাচ্চা সতেজ ও ঝর ঝরা হওয়া বাঞ্ছনীয়
- বাচ্চার চটপটে, সজাগ ও চোখ উজ্জ্বল থাকবে
- সবসময় ভাল হ্যাচারী থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে
- বাচ্চা ক্রয়ে খেয়াল রাখতে হবে যেন বাচ্চার নাভি ও মলদ্বার শুকনো থাকে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয় না, এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়াজেন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলা হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চাকে তাপানো, আর ব্রুডার হচ্ছে যেখানে বাচ্চাকে রেখে তাপানো হয়। ব্রুডিং দুই প্রকার -

• প্রাকৃতিক ব্রুডিং - মুরগির সাহায্যে ব্রুডিং করা

• কৃত্রিম ব্রুডিং - বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরোসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করা।

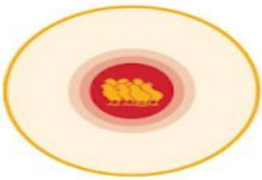		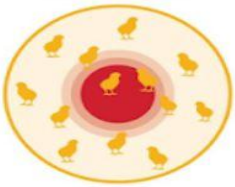
তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাচ্চা দলভূক্ত হয়েছে	তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাচ্চা ব্রডারের দেয়ালের দিকে সরে গেছে	তাপমাত্রা সঠিক হওয়ায় বাচ্চা সব জায়গায় আছে

কৃত্রিম ব্রুডিং করার নিয়ম ঃ

• ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানোর ৩দিন পূর্বে জীবানুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

• ঘরে বাচ্চা তোলার পর প্রথমে প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ, ০.৫ গ্রাম ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি মিশ্রিত পানি অন্তত ৬ ঘন্টা খাওয়ানোর পর বাচ্চাকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

• ব্রুডারের নিচে পর্যাপ্ত তাপের জন্য প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া প্রয়োজন।

• শীতকালে ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে।

• চিক গার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তাপ দেবার জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাহিরে যেতে না পারে; চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়ার আগেই পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে।

• প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময়, এ সময়ে ব্রুডারে তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাচল করবে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য ও পানি খাবে, তখন বুঝতে হবে বাচ্চা সুস্থ্য আছে।

• ব্রুডারে তাপ বেশী হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে থাকবে ও চিক গার্ডের গা ঘেষে জমা হবে এবং তাপ কম হলে বাচ্চা বেশী তাপের আশায়

হোভার এর নীচে ভীড় করবে এবং পরস্পর বাচ্চা জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করবে, তখন বাচ্চা অধিক চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারাও যেতে পারে; তাই এই অবস্থায় হোভার উঁচু-নীচু করে তাপ কম-বেশী করতে হবে।

লিটার ব্যবস্থাপনা ঃ

• লিটার হচ্ছে মুরগির বিছানা, যা ধানের তুষ হলে ভাল হয়; তবে ধানের তুষ ও কাঠের গুড়া মিশ্রণ হলে কাঠের গুড়া সর্বোচ্চ ৬০% ব্যবহার করা যাবে।

• লিটারে কম আদ্রতা বা বেশী আদ্রতা উভয়ই ক্ষতিকর।

• লিটার ১ম মাস সপ্তাহে ২ বার ও ২য় মাস ১৫দিন অন্তর উল্টাতে-পাল্টাতে হয় ।

• ২ মাস পর মুরগি নিজেরাই লিটার উল্টোনো-পাল্টানোর কাজটি ভালভাবে করে থাকে; তাই ২ মাস পর থেকে প্রতি মাসে ১ বার লিটারের পরিচর্যা করলে চলে।

সেডে পানির ব্যবস্থাপনা ঃ

• মুরগির সেডে লম্বা বা ঝুলন্ত পানির পাত্র থাকতে হবে

• বড় মুরগির জন্য সেডে প্রতি ১০ ফিট অন্তর পানির পাত্র বসাতে হবে; পানির পাত্রে সবসময়েই পানি রাখতে হবে, তা না হলে ডিম উৎপাদন কমে যাবে।

• সেডে তাপ বাড়লে মুরগি তুলনামূলকভাবে পানি বেশী খাবে এবং তাপ কমলে পানি কম খাবে।

মুরগির তাপ ব্যবস্থাপনা ও তাপমাত্রার প্রভাব ঃ

• মুরগির গ্রহণযোগ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২১°-২৬°C (৭০°-৭৯° F), তবে আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মুরগির দৈহিক তাপমাত্রা বেড়ে যাবে।

• আবহাওয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে মুরগি বেশী পানি পান করবে, ফলে পায়খানার সাথে পানির পরিমান বৃদ্ধির কারণে লিটার ভিজা থাকবে।

• গরমকালে অধিক তাপমাত্রার জন্য মুরগি দিনে যে পরিমান খাদ্য গ্রহণ কম করবে, রাত্রে ১/২ ঘন্টা আলো জ্বালিয়ে খাবার দেয়া হলে তা পুরণ হবে।

• দীর্ঘ সময় উচ্চ তাপমাত্রা মুরগির ডিমের আকার ও খোসার মান খারাপ হবে।

আলো ব্যবস্থাপনা ও এর প্রভাব ঃ

• মুরগির বাচ্চাকে অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য মুরগির ঘরে

০-৩ দিন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা আলো থাকা প্রয়োজেন এবং পরবর্তীতে ৪-৭ দিন পর্যন্ত ২৩ ঘন্টা আলো খাকা প্রয়োজন।

• ২-১৮ সপ্তাহ মুরগির বাড়ন্ত সময়, এসময়ে মুরগির ঘরে আলো কমিয়ে ১২ ঘন্টায় নিয়ে আসতে হবে; এসময় আলো বেশী দেয়া হলে মুরগির পরিপূর্ণতা আগে হবে, আগে ডিম পাড়া শুরু করবে, ডিমের আকার ছোট হবে এবং মোট ডিম উৎপাদন কম হবে; তাই দিনের আলো ১২ ঘন্টার বেশী হলে মুরগির ঘরে ছালার চট দিয়ে
অন্ধকার করে নিতে হবে।

• ১৯ সপ্তাহ থেকে মুরগি ডিম পাড়া শুরু করে, তাই ১৯ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুরগির ঘরে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত আলো রাখতে হবে।

• রাত্রে তিন ঘন্টা অন্ধকারের পর এক ঘন্টা আলো দিলে কম খাদ্যে বেশী ডিম পাওয়া যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন দৈনিক মোট আলো ১৬ ঘন্টার চেয়ে বেশী না হয়।

• প্রতি সপ্তাহে একবার বা দুইবার পরিস্কার করা হলে আলোর উজ্জলতা বৃদ্ধি পাবে।

দেশী মুরগি পালন কৌশল ঃ

দেশী মুরগি সাধারণত বাড়ীর আঙ্গিনায় চড়িয়ে-বেড়িয়ে নিজেরাই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। এদেরকে তেমন কোন খাদ্য সরবরাহ করা বা যত্ন নেয়া হয় না। ফলে এদের উৎপাদনও কম হয়। অন্যদিকে একটি দেশী মুরগী ডিমে তা দিয়ে ১২-১৪টি বাচ্চা ফুটালেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ২/৩টি বাচ্চা বেঁচে থাকে। অথচ উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বন করে দেশী মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে বাজারে দেখা যায় ব্রয়লার মুরগি চেয়ে দেশী মুরগির দাম প্রায় তিনগুন। ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক দেশী মুরগি পালন করে সহজেই আয় বৃদ্ধিসহ পারিবারিক অপুষ্টি লাঘবে যথেষ্ট সহায়তা করা যায়।

গবেষনায় দেখা গেছে দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে বিক্রি করার চেয়ে ডিম ফুটিয়ে ৮-১২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা মুরগি লালন-পালন করে বাজারে বিক্রি করলে লাভ বেশী হয়। তবে একটি পারিবারিক দেশী

মুরগির খামারে একসঙ্গে কমপক্ষে ১০টি মুরগি ও ১টি মোরগ থাকতে হবে। মোরগটি অবশ্যই বড় আকারের হতে হবে, তা না হলে মুরগি ডিমে তা দেয়ার পর ডিম ফুটানোর সংখ্যা কম হবে।

দেশী মুরগি পালনে শুরুতে মুরগিগুলোকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর ৭ (সাত) দিন পর প্রথমে রানীক্ষেত ও তার ৭ (সাত) দিন পর বসন্ত রোগের টীকা দিতে হবে। মুরগির গায়ে উকুন থাকলে তাও মেরে নিতে হবে। পারিবারিক পদ্ধতিতে এতগুলো মুরগি লালন-পালন করায় বাড়ীর আঙ্গিনায় চড়িয়ে-বেড়িয়ে তারা চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সগ্রহ করতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে বাজার থেকে লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য ক্রয় করে প্রতিদিন প্রতিটি মুরগিকে ৫০-৬০ গ্রাম করে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তাহলে ডিম উৎপাদন বাড়বে এবং ডিমের মানও ভাল থাকবে। মুরগি ডিম পাড়া শেষ হলে এক সময়ে উমে আসবে।তখন একটি মুরগির নীচে ১৪-১৬টি ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

খামারের আদলে বাঁশ/কাঠ, খড়/তাল/নারকেল/সুপারি পাতা, ইত্যাদি দিয়ে যত কম খরচে পারা যায় স্থানান্তর যোগ্য মুরগির ঘর তৈরী করতে হবে। ঘরটি মজবুত করতে হবে যাতে বন্যপ্রাণি ঘরে প্রবেশ না করতে পারে। ঘর তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঘরটি সঠিক মাপের হয় এবং ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে ।

ডিম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মুরগি ডিম তা দিয়ে বাচ্চা ফুটানো ঃ

মুরগি ডিম পাড়ার পর ডিম সংগ্রহের সময় শুধু ভাল আকারের ডিমের গায়ে হালকা করে পেন্সিল দিয়ে তারিখ লিখে ঠান্ডা জায়গায় ডিম সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যান্য ডিম খাবার ডিম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ডিম পাড়া শেষ হলেই মুরগি কুঁচো হবে। তখন গরমকালে ৫-৬ দিনের সংগৃহীত ডিম এবং শীতকালে ১০-১২ দিনের সংগৃহীত ডিম ফুটানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। উমে বসানো মুরগির সামনে একটি পাত্রে সবসময় খাবার ও অন্য একটি পাত্রে পানি দিয়ে রাখতে হবে, যাতে সে ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে খেতে পারে। তাহলে ডিম তা দেয়ার সময় মুরগির ওজন হ্রাস পাবে না ও বাচ্চা তোলার পর

মুরগি আবার তাড়াতাড়ি ডিম পাড়া শুরু করবে। ডিম তা দেয়ার ৭-৮ দিন পর রাতের বেলায় অন্ধকারে মোমবাতির আলোতে ডিম পরীক্ষা করলে ডিমে বাচ্চা না থাকলে তা সহজেই চেনা যাবে। তখন এ ধরণের ডিম সরিয়ে ফেলতে হবে।

প্রতিটি ডিমের গায়ে সমভাবে তাপ লাগার জন্য দিনে কম পক্ষে ৫-৬ বার ওলটপালট করতে হয়। সাধারণত দেশী মুরগি এ কাজটি সহজে করে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যদি মুরগি এ কাজটি না করে তখন আমাদেরকেই একাজটি করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন এ কাজটি করতে গিয়ে মুরগি বিরক্ত না হয়। ডিম ফুটার জন্য বাতাসের আদ্রতাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ডিম তা দেয়ার ১-১৮দিন পর্যন্ত বাতাসের আদ্রতা ৫৫% এবং ১৯-২১ দিন সময়ে ৭০-৮০% থাকলে বাচ্চা ফুটার হার বেশী হয়। বাতাসের আর্দ্রতা মাপার জন্য বাজারে যন্ত্র পাওয়া যায় এবং এর দামও কম। তাই বাতাসের আর্দ্রতা মাপার জন্য আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশে সধারণত খুব গরম ও শীতের সময় বতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। এ সময়ে ডিম উমে বসানো হলে এবং বাতাসের আর্দ্রতা প্রয়োজন অনুযায়ী কম থাকলে দৈনিক দু'বার একটি পরিষ্কার কাপড় কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে হাত দিয়ে চিবিয়ে পানি ফেলে দিতে হবে। এরপর উক্ত ভিজা কাপড় দিয়ে ডিম মুছে দিলে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা পাওয়া যাবে। উক্ত ব্যবস্থা ঝামেলা মনে হলে দৈনিক দু'বার হাত কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে হালকা ভাবে ঝেড়ে হাতের বাকি পানিটুকু ডিমের উপর ছিটিয়ে দিলেও প্রয়াজেনীয় আর্দ্রতা পাওয়া যাবে। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর ৫-৬ ঘন্টা পর্যন্ত মা মুরগিকে দিয়ে বাচ্চাকে উম দিতে হবে। তাতে বাচ্চা শুকিয়ে ঝরঝরে হবে। গরমকালে বাচ্চার বয়স ৩-৪ দিন এবং শীতকালে ১০-১২ দিন পর্যন্ত বাচ্চার সাথে মাকে থাকতে দিতে হবে। এ সময়ে মুরগি নিজেই বাচ্চাকে উম দিবে। এতে কৃত্রিম উমের (ব্রুডিং) প্রয়াজেন হবে না। এ সময়ে মা মুরগিকে খাবার দিতে হবে। মা মুরগির খাবারের সাথে বাচ্চার খাবারও আলাদা করে দিতে হবে। বাচ্চাগুলো মায়ের সাথে থেকে খাবার খাওয়া শিখবে। উক্ত সময়ের পর মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করতে হবে এবং কৃত্রিম ভাবে বাচ্চাকে ব্রুডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং মুরগির বাচ্চা পালন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

এ পর্যায়ে মা মুরগিকে আলাদা করে লেয়ার খাদ্য দিতে হবে এবং মুরগিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন দিতে হবে। এ সময়ে মা মুরগি ও বাচ্চা মুরগিকে এমনভাবে আলাদা করতে হবে যেন বচ্চারা মুরগির দৃষ্টির বাহিরে থাকে। এমন কি বাচ্চা/মা চিচি শব্দও যেন শুনতে না পায়। তা না হলে মা ও বাচ্চার ডাকাডাকিতে কেউ কোন খাবার বা পানি খাবে না। তবে ২/৩ দিন পর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকে না।

প্রতিটি মুরগিকে এ সময় ১৫ দিনের জন্য ৮০-৯০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিতে হবে। সাথে সাথে ৫-৭ ঘন্টা চড়ে বেড়াতে দিতে হবে। এরপর পূর্বের ন্যায় দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিলে চলবে। প্রতিটি মুরগিকে ৩-৪ মাস পর পর কৃমির ঔষধ এবং ৪-৫ মাস পর পর রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। সাধারণত একটি দেশি মুরগি ডিম পাড়ার জন্য ২০-২৪ দিন সময় নেয়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ২১ দিন সময় নেয়। বাচ্চা লালন পালন করে বড় করে তোলার জন্য ৯০-১১০ দিন সময় নেয়। এভাবে ডিম থেকে বাচ্চা বড় করা পর্যন্ত একটি দেশী মুরগির উৎপাদন শেষ করতে স্বাভাবিক অবস্থায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে। কিন্তু মা মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করার ফলে এই উৎপাদন সময় ৬০-৬২ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করা যায়। অর্থাৎ সময় অর্ধেক কমে যাবে ও বাকি সময় মুরগিকে ডিম পাড়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে। ফলে ডিম পাড়ার জন্য মুরগি বেশী সময় পাবে ও ডিম উৎপাদন বেশী হবে। এই পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটার সংখ্যাও বেশী হয় এবং বাচ্চা মুরগির মৃত্যুর হারও অনেক কম হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্বিগুনের চেয়েও বেশী পাওয়া যায়।

মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

পোল্ট্রি শিল্পে ৭০% খরচ হয় খাদ্যে। বয়সভেদে ডিম পাড়া জাতের মুরগির খাদ্য মূলত তিন প্রকার -

- ০-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা মুরগির খাদ্য (ষ্টার্টার মুরগী)।
- ৭-২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য (বাড়ন্ত মুরগী)

➢ ২১-উপরে সপ্তাহ বয়সের ডিম পাড়া মুরগির খাদ্য (লেয়ার মুরগী)

• মুরগির খাদ্য প্রস্তুত করতে মূলত গম/ভূট্টা ভাঙ্গা, চালের কুড়া, ঝিনুক চূর্ণ, লবন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন কনসেনট্রেট এর প্রয়োজন হয়।

• পুষ্টিমান হিসাবে খাদ্যে মোট ৬টি উপাদান থাকে, যেমন- আমিষ, শর্করা, খনিজ, চর্বি বা তৈল, ভিটামিন ও পানি যা বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন খাদ্য উপকরণে উপস্থিত থাকে।

• দেশে বর্তমানে উন্নত মানের প্রস্তুতকৃত সব বয়সের মুরগির খাদ্য সর্বত্র পাওয়া যায়। খামারে খাদ্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন উপাদান সবসময়ে সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় এখন বাণিজ্যিক মুরগি পালনে খামারীগন বাজারে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত মুরগির খাদ্য ব্যবহার করে থাকেন।

তবে লেয়ার খাদ্যে নির্দিষ্ট পরিমানে আমিষ থাকা অত্যন্ত জরুরী, যেমন-

➢ ডিম পাড়ার পূর্বে ১৩% আমিষ
➢ ডিম পাড়া শুরু করলে ১৬% আমিষ
➢ ডিম পাড়া সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছলে ১৭-১৯% আমিষ
➢ ডিম উৎপাদনের চক্রের শেষ পর্যায়ে ১৪% আমিষ

• মুরগির খাদ্যে আমিষের পরিমান কম হলে ডিমের আকার ছোট হয় এবং আমিষের পরিমান বেশী হলে ডিমের আকার বড় হবে তাই আমিষের পরিমান সঠিক হওয়া প্রয়োজন।

• মুরগির উৎপাদন সঠিক রাখার জন্য বাজারে যে ফিডমিলের খাদ্য ভাল তা খাওয়ানোর প্রয়োজন। তবে হঠাৎ খাদ্য পরিবর্তন করলে ডিম উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লেয়ার মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

• প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগির আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।

• আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনুসারে পানি পানের পরিমান যাচাই করতে হবে।
• খাদ্য ও পানি গ্রহণের উপর মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
• ঘরে মুরগির মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।
• মুরগিকে নিয়মিত টীকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
• খামারের জীব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে

মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। বায়োসিকিউরিটি মেনে চলে সংক্রমন হ্রাস করাই লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত। সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই মুরগির খামার করা সম্ভব। মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলোঃ

ডিম উৎপাদনে মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১ দিন	মারেক্স
৫-৭ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
২৮ দিন	ফাউলপক্স
৬০ দিন	রাণীক্ষেত
৭০ দিন	ফাউলপক্স
১০৫ দিন	রাণীক্ষেত
১১০ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করাইজা, ইডিএস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

• টিকা সবসময়ই সুস্থ্য অবস্থায় প্রয়োগ করতে হয়, অসুস্থ মুরগিকে কোন অবস্থাতেই টিকা দেয়া যাবে না ।

• ২ মাসের উর্দ্ধে মুরগিকে টিকা দেয়ার পূর্বে কৃমিনাশক দিতে হবে।

• সকালে/সন্ধ্যার সময় ঠান্ডা আবহাওয়ায় টিকা প্রয়াগে করলে ভাল হয়।

• টিকা গোলানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করতে হবে; টিকা গোলানোর পর প্রস্তুতকৃত টিকা গরমকালে ১ ঘন্টা এবং শীতের দিনে ২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করতে পারলে টিকার গুণগত মান ভাল থাকে

• টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে ঠান্ডা অবস্থায় পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে।

মুরগীর নিম্নে বর্ণিত রোগ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে

- ❖ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা
- ❖ গামবোরো
- ❖ রানীক্ষেত
- ❖ ফাউল বসন্ত
- ❖ রক্ত আমাশয় বা কক্সিডিওসিস
- ❖ ফাউল কলেরা

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ➢ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগি মারা যেতে পারে।

- মৃত্যুহার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে।
- মাথা, মুখ, ঝুটি ফুলে যেতে পারে, পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুঁটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণয় শেষে খামারের সকল মুরগি বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়। কেননা, এ রোগ মুরগি হতে মানুষে বিস্তার হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

রানীক্ষেত

এটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। নিউক্যাসল ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই রোগ এনডেমিক আকারে দেখা যায়। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষনঃ

- চুনা বা সবুজ রং এর রক্তাক্ত কিংবা তরল পায়খানা করবে।
- শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শব্দ করবে এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে।
- পাখা ছেড়ে দিয়ে ঝিমাতে থাকে।
- খাওয়া-দাওয়া ও ডিম পাড়া বন্ধ করে দিবে।
- এ রোগ থেকে মোরগ-মুরগি বেঁচে গেলে অনেক সময় ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে।

রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে, কোন কোন সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা ঃ

ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। পটাশিয়াম - পার - ম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানি সরবরাহ করা হলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

গামবোরো রোগ ঃ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্বক রোগ। ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ/গামবোরো ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ১৫-২৫ দিন বয়সের মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ অত্যান্ত বেশী। এরোগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজেই অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

• মুরগির অবসন্নতা হবে এবং পালক কুচকানো হবে

• মুরগির মলদার ময়লাযুক্ত হবে।

• উচ্চ তাপমাত্রা, কাপুঁনি ও পানির মত ডায়রিয়া হবে

• প্রতিদিন খামারে অনেক মুরগি মারা যাবে।

• রোগের প্রাদুর্ভাব কমে আসলে মৃত্যু বন্ধ হবে, তবে এ রোগে থেকে বেঁচে যাওয়া মুরগি থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাবে না।

রক্ত আমাশয়/কক্সিডিওসিস ঃ

ইহা প্রটোজোয়া সংক্রমণ জনিত মারাত্বক রোগ। কক্সিডিয়া নামক প্রটোজোয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে

পারে। তবে বাচ্চা বয়সে রোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ

কক্সিডিওসিস রোগের লক্ষণ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, পাখা ঝুলে যায়, শরীর শুকিয়ে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- রক্ত মিশ্রিত পায়খানা দেখা যায়
- বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিপ্রটোজোয়াল ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইম্যিউস্টিমুল্যান্ট ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে
- কক্সিডিওসিস এর টিকা প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে টিকা প্রদান করা যেতে পারে
- লিটার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী, কেননা এ রোগের বিস্তার সংক্রমিত লিটার হতেই শুরু হয়ে থাকে

ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ

এ রোগ ফাঙ্গাস সংক্রমন জনিত রোগ। এরোগে আক্রান্ত মুরগির ফুসফুসে ফাঙ্গাল গ্রোথ দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুঁষ বা কাঠের গুড়া ফাঙ্গাস সংক্রমিত হলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষন না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে
- আক্রান্ত মুরগিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং মারা যায়

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে মুরগির খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

বসন্ত রোগ

বসন্ত মুরগির একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগ ফাউল পক্স নামে পরিচিত। যে কোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। তবে ২-৩ মাসের কম বয়সের বাচ্চার বেলায় এ রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

বসন্ত রোগের লক্ষণ ঃ

ফাউল পক্স রোগের

• মোরগ-মুরগির পালক বিহীনস্থানে এ রোগের লক্ষন প্রকাশ পায়।

• মাথার ঝুটি, লতি, মুখের কোনায়, চোখের পাতায় এবং মাঝে মাঝে পায়ে ছোট ছোটে আঁচিলের মত গুটি দেখা যায়।

• গুটি হওয়ার আগে প্রথমে লাল হয় ও রস জমা হয় এবং পরে গুটি কাল হয়।

• মুরগি খাওয়া থেকে বিরত থাকে ও ডিম পাড়া কমে যায়।

• এ রোগে বয়স্ক মুরগির মৃত্যুর হার কম, তবে বাচ্চা মুরগির মৃত্যুর হার বেশী।

• বড় মোরগ-মুরগি ৩-৪ সপ্তাহ রোগে আকান্ত হওয়ার পর ভাল হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

- ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
- পটাশের পানি দিয়ে গুঁটি বা ঘা পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘায়ে সালফোনিলামাইড পাউডার লাগানো যেতে পারে।

রোগের বিস্তারের কারণসমূহ ঃ

• **অসুস্থ্য মুরগি ঃ** অসুস্থ্য মুরগির মল, কফ, সর্দি, ক্ষত হতে বের হতে হওয়া রক্ত ও বর্জ্য ইত্যাদির মাধ্যমে মুরগির দেহে রোগ বিস্তার হয়।

• **পানি ঃ** কৃমির ডিম অসুস্থ্য মুরগির শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া পালক, বিভিন্ন প্রকার জীবানু দ্বারা দূষিত পানির মাধ্যমে রোগ বিস্তার হয়।

• **বাতাস ঃ** দূষিত বাতাস থেকে শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে মুরগির দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে।

• **মাটি ঃ** অনেক রোগ জীবানু ও কৃমির ডিম মুরগির ঘরের ভেজা মাটিতে বেশদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও সেখান থেকে মুরগির দেহে প্রবেশ করে।

• **সংস্পর্শ ঃ** পরিচর্যাকারী দূষিত মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে ঐ জীবাণু মুরগির ঘরে বিস্তার লাভ করতে পারে। রোগাক্রান্ত মুরগি পালকের সংস্পর্শে থেকেও রোগ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে । মুরগির ডিম ও হ্যাচারিতে অসুস্থ মুরগির ডিম থেকেও এ সমস্ত রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।

• **বাহক ঃ** অনেক সময় সুস্থ মুরগি নিজে অসুস্থ না হলেও রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে; তাছাড়া মানুষ বা অন্য কোন প্রানী, খামারের সরঞ্জামাদি রোগের বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে ।